প্র ব ন্ধ

করোনা দুনিয়ায় বাংলাদেশ

আ নু মু হা ম্ম দ

২০২০ সালে দুনিয়া প্রত্যক্ষ করছে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি, থেমে গেছে সবকিছু। চোখে দেখা যায় না এরকম ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র করোনা ভাইরাস দুনিয়াকে একদিকে থামিয়ে দিয়েছে অন্যদিকে তার চেহারা উদাম করে দিয়েছে। এরকম সময় মাঝে মাঝে আসে যখন সবকিছু উদাম হয়ে যায়। ট্রিলিয়ন ডলারের যুদ্ধ-অর্থনীতি, ডিজিটাল প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মুহূর্তে লক্ষ মানুষ হত্যার সরঞ্জাম সবকিছু নিয়ে বিশ্ব এখন করোনা ভাইরাসের কাছে পুরোই অসহায়। বর্তমান বিশ্ব (অ)ব্যবস্থা মানুষ খুন করতে পরিবেশ বিনাশ করতে যতসম্পদ দরকার দিতে রাজি, মানুষের নিরাপত্তার জন্য তার কোনো মাথাব্যথা নেই, এক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিও তুলনায় দুর্বল। সর্বজনের চিকিৎসা অবকাঠামো পুঁজির আঘাতে বহু জায়গাতেই বিপর্যস্ত। বাংলাদেশে তো এই ব্যবস্থা দাঁড়ায়ইনি। বাণিজ্যিকীকরণে সর্বজনের চিকিৎসা ব্যবস্থা কোণঠাসা। পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার নেতা যুক্তরাষ্ট্রের মতো সম্পদশালী দেশ সারা দুনিয়ায় সামরিক ঘাঁটি চালাচ্ছে, অথচ সেদেশে হাসপাতালে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নেই। বিভিন্ন রাষ্ট্রের চেহারা তাই আরও খোলাসা হচ্ছে এই সময়ে। কোন রাষ্ট্র এই সুযোগে আরও নজরদারি বাড়াচ্ছে, বলপ্রয়োগের সংস্থাগুলো গোছাচ্ছে, কোন রাষ্ট্র বৃহৎ ব্যবসায়ীদের বৃহৎ সুবিধা দিতে সংকটকে ব্যবহার করছে, কোন রাষ্ট্র নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধানে সাধ্যমতো মনোযোগ দিচ্ছে, কোন রাষ্ট্র আগে থেকেই নাগরিকদের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়ায় এখন নির্ভার হয়ে অন্য দেশের মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে তা-ও পরিষ্কার হচ্ছে।

ফ্রম ‘ডিসাস্টার ক্যাপিটালিজম’ টু ‘করোনা ভাইরাস ক্যাপিটালিজম’

বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার প্রধান খুঁটি হচ্ছে চারটি: যুদ্ধ-সমরাস্ত্র, জীবাশ্ম জ্বালানি, আর্থিক খাত এবং কৃষিতে বিষের বাণিজ্য। এই চারটি ক্ষেত্রেই গুরু হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যারা বিশ্বে সব থেকে পরাক্রমশালী। সারাবিশ্বে যুদ্ধ, গোয়েন্দা নজরদারি এবং পারমাণবিক-রাসায়নিক-জৈব অস্ত্র গবেষণা ও মজুদের যে ভয়ংকর চিত্র তার পেছনে প্রধান শক্তি হচ্ছে এইদেশ। এত পরাক্রমশালী হওয়া সত্ত্বেও করোনা ভাইরাসের আক্রমণে এদেশটি এককভাবে সবচাইতে বেশি বিপর্যস্ত।

লেখক গবেষক সংগঠক নাওমি ক্লেইন কয়েকবছর আগে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নিয়ে। এর নাম ছিল ‘ডিসাস্টার ক্যাপিটালিজম’। অজানা বিপদ করোনা ভাইরাস সারা বিশ্বকে অভূতপূর্ব মাত্রায় অস্থির করে তোলার পর লিখেছেন “ফ্রম ‘ডিসাস্টার ক্যাপিটালিজম’ টু ‘করোনা ভাইরাস ক্যাপিটালিজম’”। আসলে বর্তমান উন্নয়ন ধারার সাথে এই দুই-ই গভীরভাবে সম্পর্কিত।

সমরাস্ত্র উৎপাদন, সামরিকীকরণ, যুদ্ধ এবং নজরদারি একদিকে মুনাফা আর ক্ষমতার অন্যতম মাধ্যম, অন্যদিকে এগুলোই হচ্ছে বিশ্বজুড়ে সম্পদ অপচয় ও বর্জ্য উৎপাদনের সবচাইতে বড় এবং বিধ্বংসী উৎস। পারমাণবিক বর্জ্য ভয়াবহ বর্জ্যের পাহাড় তৈরি করছে বিশ্বে। পারমাণবিক বিদ্যুৎ, পারমাণবিক বোমা, ইউরেনিয়ামসহ বিভিন্ন খনিজদ্রব্য উত্তোলন এবং এসব কেন্দ্র করে সামরিক বিভিন্ন কর্মসূচি থেকে যে বর্জ্য উৎপাদিত হয় তা বিপজ্জনক মাত্রায় পানি, মাটি সহ পরিবেশকে সমাধান অযোগ্য মাত্রায় নষ্ট করছে। প্রাণ বৈচিত্র্যের শক্তি বিনষ্ট করে বাস্তুসংস্থান ও পরিবেশগত ভারসাম্য বিপন্ন করছে। এসব ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় অপরাধী হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, সরকারি হিসাবেই সেখানে কোটি কোটি টন রেডিও-একটিভ বর্জ্য, ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি, মজুত হয়ে আছে। বিশ্বজুড়ে পারমাণবিক বর্জ্য কীভাবে নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় রাখা যাবে কিংবা কীভাবে এগুলোর বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে তার কোনো সন্তোষজনক সমাধান এখনও পাওয়া যায়নি। জৈব-রাসায়নিক অস্ত্র নিয়ে গবেষণার প্রতিযোগিতা বাড়ছে, তা থেকে দেশে দেশে তৈরি হচ্ছে একেকটি ভয়ংকর বিপদের মজুদ। আর এসব ক্ষেত্রে দুনিয়ার নেতৃত্ব দিচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্র সেখানে হাসপাতালে চিকিৎসা-সরঞ্জামের অভাবে মানুষ মরছে। কেননা সর্বজনের চিকিৎসা ব্যবস্থা সেখানে কোম্পানি-স্বার্থ আর যুদ্ধ-অর্থনীতির কাছে কোণঠাসা হয়ে গেছে।

গত কয়েক দশকে যুদ্ধসহ বর্জ্য উৎপাদনের ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হয়েছে। ১৯৫০ সাল নাগাদ বিশ্ব জুড়ে প্লাস্টিক উৎপাদন ছিল ২০ লাখ টন, ২০১৬ সাল নাগাদ তা ২শ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪০ কোটি টনে। এর মধ্যে ১৩ কোটি টন প্লাস্টিক বর্জ্যই শেষ পর্যন্ত গিয়ে জমা হয় সমুদ্রে। প্লাস্টিক সামগ্রী ও বর্জ্যের এরকম উচ্চহারে বৃদ্ধি ঘটছে পণ্যের প্লাস্টিক প্যাকেজিং এবং 'ওয়ান টাইম' সামগ্রীর অনুপাত বৃদ্ধির কারণে। এটা ধারণা করা হচ্ছে যে, এভাবে চলতে থাকলে ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বজুড়ে প্লাস্টিক উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াবে ৩৪০০ কোটি টন। বহু শিল্পোন্নত দেশ এখন রিসাইক্লিং বা পুনরুৎপাদনের জন্য তাদের প্লাস্টিক বর্জ্য প্রান্তিক দেশগুলোতে রপ্তানি করছে। ২০১৭ সালে নিষিদ্ধ করার আগে পর্যন্ত চীনই ছিল এসব প্লাস্টিক পণ্যের প্রধান ক্রেতা। এখন এসব পণ্যের প্রধান গন্তব্য হচ্ছে মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম এবং বাংলাদেশ। বাংলাদেশে বেশিরভাগ প্লাস্টিক পণ্য নদীতে এবং তারপর সমুদ্রে গিয়েই জমা হয়। সমুদ্রে প্লাস্টিক জমার পরিমাণের দিক থেকে বাংলাদেশসহ এই চারটি দেশকেই এখন প্রথম দশটির মধ্যে গণ্য করা হয়।

এছাড়া বিশ্বজুড়ে উচ্চহারে ইলেক্ট্রনিক পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে প্রতিবছর প্রায় ৫ কোটি টন ইলেক্ট্রনিক বর্জ্য তৈরি হচ্ছে। প্রতিবছর যুক্তরাষ্ট্রে ৩ কোটি কম্পিউটার বাতিল করা হয়, ইউরোপে ১০ কোটি ফোন বাতিল হয়। এর ১৫-২০ শতাংশ পুনরুৎপাদনে যায়, বাকি পুরোটাই জমে মাটিতে, পানিতে। যুক্তরাষ্ট্রের পরেই চীনের স্থান। চীনে দেশের ভেতরে ই-বর্জ্য তৈরি হয় ৩০ লাখ টনেরও বেশি। এর পরিমাণ বৃদ্ধি শুধু চীন নয় বিশ্বের প্রাণ-প্রকৃতির জন্য হুমকি হয়ে ওঠছে। কেননা এগুলোর বিষাক্ত প্রভাব দেশের সীমানায় আটকে থাকে না।

বিশ্বে প্রতিবছর সমরাস্ত্র ক্রয়, তা নিয়ে বিপজ্জনক ব্যয়বহুল গবেষণা, নজরদারি ইত্যাদিতে ব্যয় হয় প্রায় ২ ট্রিলিয়ন ডলার (বা ২ হাজার বিলিয়ন, ১ বিলিয়ন মানে ১শ কোটি) যা বাংলাদেশের বর্তমান পরিমাণ অনুযায়ী প্রায় ৪০ বছরের মোট বাজেট অর্থের সমান। এর একশো ভাগের একভাগ খরচ করলে সারাবিশ্বের মানুষ বিশুদ্ধ নিরাপদ পানি পেতে পারেন। কিন্তু মানুষ-হত্যা, পরিবেশ বিনাশে যত সম্পদ ব্যয় হয় মানুষ বাঁচাতে তার এককণাও পাওয়া যায় না। সেজন্য চিকিৎসা-গবেষণাতেও হয় খুবই অপ্রতুল বরাদ্দ। জানা অসুখ নিয়ে গবেষণাও যথেষ্ট নয়। সমরাস্ত্র খাতে যে অর্থ ব্যয় হয় তার একাংশ যায় পারমাণবিক, জৈব-রাসায়নিক অস্ত্র নিয়ে গবেষণায়। সেগুলো বিভিন্ন প্রাণী, সমুদ্র, বায়ুম-লে কী বিষ তৈরি করে তা অনুমান করা শক্ত নয়। তাই বর্তমান প্রবৃদ্ধিমুখী উন্নয়ন, কতিপয় অঞ্চল ও শ্রেণির অতিভোগ আর মুনাফামুখি উন্মাদনা থেকে সৃষ্ট ভয়ংকর বর্জ্যের পাহাড় বহুরকম

জানা অজানা রোগের উর্বর ভূমি তৈরি করে। রাষ্ট্রীয় সীমানা দিয়ে এসব রোগ যে ঠেকানো যায় না সেটাই দেখাচ্ছে বিভিন্ন ভাইরাস সর্বশেষ করোনা ভাইরাস।

এটা ঠিক যে, শিল্পোন্নত দেশগুলোতে বাংলাদেশের মতো প্রাথমিক পর্যায়ের বর্জ্য নিয়ে ভয়ংকর অব্যবস্থাপনা দেখা যায় না। কিন্তু এসব দেশে পুঁজির আধিপত্যের মধ্য দিয়ে শিল্পবর্জ্য, পারমাণবিক বর্জ্য, প্লাস্টিক ও ইলেক্ট্রনিক বর্জ্যের যে পাহাড় তৈরি হচ্ছে তা তারা বিদেশি 'সাহায্য' আর বিদেশি বিনিয়োগের নামে স্থানান্তর করছে বাংলাদেশের মতো প্রান্তস্থ দেশগুলোতে।

পুঁজির গতিতে জিডিপি বাড়ছে, একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হচ্ছে, জৌলুস বাড়ছে আর বাংলাদেশসহ পুরো বিশ্ব বর্জ্যের পাহাড়ের নিচে চাপা পড়ছে। অপচয় আর প্রাণ-প্রকৃতি-মানুষ বিধ্বংসী তৎপরতা হয়ে দাঁড়াচ্ছে বিশ্বব্যবস্থার আসল চেহারা। জলবায়ু পরিবর্তনের চাপ বাড়ছে- সমুদ্র, নদী মহাবিপর্যয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে। বাংলাদেশে বর্জ্যবান্ধব উন্নয়নে সরকারের একগুঁয়ে উন্মাদনায় বিপদ বাড়ছে আরও বেশি। করোনা ভাইরাস তার একটি।

সম্পদ ও উন্নয়নের অগ্রাধিকার

বাংলাদেশের সরকার বলতে চায়-- করোনা মোকাবিলায় যেখানে সবচাইতে পরাক্রমশালী 'উন্নত' দেশ যুক্তরাষ্ট্রই বিপর্যস্ত সেখানে অন্যরা কীভাবে পারবে? আসলে করোনা ভাইরাসের এই ভয়ংকর বৈশ্বিক সংকট আমাদের উন্নয়নের সংজ্ঞা নতুনভাবে ভাবতে চাপ দেয়, চোখ এবং চিন্তার বদ্ধতা কাটানোর পথ দেখায়। দেখায় যে, পেশির জোর, অস্ত্র আর অর্থের দাপট, বহুতল ভবন, জৌলুস থাকা মানেই উন্নয়ন নয়। কোনো দেশে সম্পদ কম থাকতে পারে, জৌলুস না-থাকতে পারে কিন্তু যদি নাগরিকদের সেদেশে খাদ্য-চিকিৎসা-জীবনের নিরাপত্তা থাকে, সম্মান থাকে, গুরুত্ব থাকে, যদি সেখানে প্রাণ-প্রকৃতির সুরক্ষা থাকে তাহলে সেদেশই উন্নত।

মানুষের জগতে রোগ, দুর্যোগ নানামাত্রায় আসতেই পারে। কিন্তু তাতে কোন দেশের নাগরিক কতটা বিপর্যস্ত হবেন তা নির্ভর করে ওই দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা কোন দর্শন দ্বারা পরিচালিত, কী এবং কারা সেখানে গুরুত্বপূর্ণ তার উপর। বেশি সম্পদ, কম সম্পদ যে নির্ধারক নয় তা করোনা বিপর্যয়কালে মহা পরাক্রমশালী যুক্তরাষ্ট্র আর ক্ষুদ্র কিউবার অবস্থা তুলনা করলেই স্পষ্ট হয়। এত কম সম্পদ নিয়েও কিউবা তার প্রত্যেক নাগরিকের নিরাপত্তা দিতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, তারা করোনা সহায়তার জন্য ইউরোপ ও ল্যাটিন আমেরিকার বাইশটি দেশে ডাক্তার ও চিকিৎসা সরঞ্জাম পাঠিয়েছে। অথচ বিপুল সম্পদ থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা নৈরাজ্যিক পরিস্থিতির শিকার। কেন? কারণ যুক্তরাষ্ট্রের সম্পদ ও সক্ষমতা তার নাগরিকদের চাইতে বেশি বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজির জন্য, সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাপনার জন্য, যুদ্ধের জন্য, ধ্বংসের জন্য। করোনাকালেও তাই ট্রাম্প গর্ব করে বলেন, 'আমাদের সামরিক বাহিনী বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ', বলতে পারেন না যে, 'আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।'

যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু চিকিৎসা-ব্যয় পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বেশি হলেও মুনাফামুখী ব্যক্তি-ব্যবসা, বৃহৎ বীমা ও ওষুধ কোম্পানিগুলোই তার বড় অংশ খেয়ে ফেলে। মার্কিন তথ্যচিত্র নির্মাতা মাইকেল মুরের *সিকো* এই পরিস্থিতি তুলে ধরেছে বিস্তৃতভাবে। ব্যবস্থাটাই এমন যে, স্বাস্থ্যসেবা খাতে বিশাল ব্যয় হলেও সে-দেশে কয়েক কোটি নাগরিকের চিকিৎসা-নিরাপত্তা নেই। চিকিৎসা ব্যবস্থা, চিকিৎসা গবেষণা কতিপয় গোষ্ঠীর মুনাফাবৃদ্ধির লক্ষ্য দ্বারা পরিচালিত। ফলে পৃথিবীকে ধ্বংস করার জন্য যাবতীয় অস্ত্র যোগান দেয়া তাদের জন্য হাতের তুড়ি হলেও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্রী ও গবেষণা অপ্রতুল। ডাকাতি করে নিয়ে আসতে হয় চিকিৎসা সরঞ্জাম; ভেন্টিলেটর-

আইসিইউ যথেষ্ট নেই, ডাক্তারদের সুরক্ষা সরঞ্জামের অভাব। সেকারণেই আমরা দেখি নিউইয়র্ক বিশ্বের প্রধান বাণিজ্যিক শহর হলেও সেখানে দারিদ্র্য কেন্দ্রীভূত, আর করোনায় তাদের মধ্যেই বেশি অকালমৃত্যু। যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে সারা পৃথিবী ক্ষত-বিক্ষত, একই প্রক্রিয়ায় যে সে দেশের নাগরিকেরাও জীবন ও জীবিকায় বিপর্যস্ত করোনা তাই আরও স্পষ্ট করেছে।

বিপরীতে কিউবা গত ছয় দশক ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাত্মক আগ্রাসন ও অবরোধের মধ্যে টিকে থাকতে লড়াই করছে। শক্তি-সামর্থ্য, অর্থনীতির আকার, সম্পদ কোনোদিক থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এর কোনো তুলনা হয় না। সম্পদের দিক থেকে বাংলাদেশের চাইতেও দুর্বল এই দেশ। অথচ এরকম প্রবল চাপে থেকেও দেশের প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণ করছে রাষ্ট্র, সকলকে দিচ্ছে দুধ ডিমসহ প্রয়োজনীয় খাবার, আশ্রয় এবং সর্বোত্তম চিকিৎসা। যার ফলে কিউবার নাগরিকরা প্রথম থেকেই একটা নিরাপদ অবস্থানে থাকতে পারছেন। তাদের খাদ্যের ও আশ্রয়ের সমস্যা নেই, স্বাস্থ্যসেবাখাত অনেক শক্তিশালী, সেজন্য শারীরিকভাবে তাদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাও অনেক বেশি। কিউবার সাথে চীন এবং ভিয়েতনামের তফাৎ হল, শেষের দুই দেশে বেশ কিছু বাজারমুখী সংস্কার, প্রাইভেটাইজেশন হয়েছে। তাদের সর্বজন স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা থাকলেও সকল নাগরিকের জন্য কিউবার মতো খাদ্য ও চিকিৎসার নিশ্চিত ব্যবস্থা এখন আর নাই। তবে ভিয়েতনামের শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার কারণে খুব দ্রুত তারা করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছে। এর বাইরে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী হওয়ার কারণে এশিয়ায় দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান ভালো করেছে। একইসাথে সফল মোকাবিলার জন্য ভারতের রাজ্য কেরালার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কিছু লোকের হাতে ক্ষমতা ও সম্পদ কেন্দ্রিভবন, সম্পদের মুনাফা সর্বোচ্চকরণই পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য হলেও ইউরোপের বেশ কিছু দেশে সর্বজন-শিক্ষা ও সর্বজন-স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা আমরা জানি। এগুলো সম্ভব হয়েছিল সেসব দেশের মানুষের দীর্ঘ সংগ্রাম ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার প্রভাবে। এই শর্ত দুর্বল হয়ে যাওয়ায় ৮০ দশক থেকে যেসব দেশ স্বাস্থ্য শিক্ষার বাজারমুখী সংস্কারের দিকে গেছে সেখানেই পরিস্থিতি জনবৈরী হয়েছে। ব্রিটেনে করোনাকালে বিপর্যয় তার অন্যতম উদাহরণ। ইতালিও স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপক ব্যয়হ্রাসের শিকার হয়েছে।

বাংলাদেশের উন্নয়ন ধারা: অসুখ তৈরির কারখানা

বাংলাদেশে উন্নয়ন ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে তা অদূরদর্শী, ব্যক্তি-মুনাফাকেন্দ্রিক, পরিবেশ বিধ্বংসী এবং জনস্বার্থ সম্পর্কে অন্ধ। বর্তমান পর্যায়ে বাংলাদেশে শিল্পবর্জ্য ও মেডিক্যাল বর্জ্য প্রধান হুমকি, এর সাথে প্রতিদিন যোগ হচ্ছে ভোগ্যপণ্যের বাজারের অনুসঙ্গ ক্রমবর্ধমান পরিমাণে প্লাস্টিক ও পলিথিন। এর প্রধান শিকার নদী ও জলাভূমি, সেই সঙ্গে বাতাস। গত দুদশকে বাংলাদেশে শিল্পখাতের দ্রুত বিকাশ হয়েছে। বাংলাদেশে কম-বেশি ৩০ হাজার ছোট-বড় কারখানা আছে। এসব কারখানার অনেকগুলোই ৪০টিরও বেশি ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে। গার্মেন্টস ছাড়াও ওষুধ, রসায়ন, প্লাস্টিক, জুতা, সিমেন্ট, সিরামিকস, ইলেকট্রনিকস, খাদ্যসহ বিভিন্ন ধরনের শিল্পে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বিনিয়োগ হয়েছে।

আমরা সবাই জানি যে, এসব শিল্পের অধিকাংশের বিকাশ যথাযথ নিয়ম মেনে হয়নি। কারখানা করতে গিয়ে বন উজাড় হয়েছে, জলাভূমি ভরাট হয়েছে, কারখানার বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থাও যথাযথভাবে গড়ে ওঠেনি, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কারখানা-বর্জ্য অবাধে নদী-নালা খালবিল দূষণ করছে। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুরে অবস্থা সবচাইতে খারাপ। বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু, শীতলক্ষা, ধলেশ্বরী সবই বর্জ্যের গন্তব্য। বুড়িগঙ্গা নর্দমায় পরিণত হয়েছে, অন্য অনেক নদীও সেই পথে। শ্রমিক-মজুরি, জীবন ও কাজের নিরাপত্তা, কর্মপরিবেশ কোনো কিছুই

ন্যূনতম মানে পৌঁছাতে পারেনি। কারখানার দূষণ কমানোর জন্য অপরিহার্য ইটিপি বসানো বা চালু রাখার কোনো আগ্রহ নেই কারখানা মালিকদের। গড়ে উঠেছে অনেক অবৈধ কারখানা, কিংবা বৈধ কারখানার অবৈধ তৎপরতা। আবাসিক এলাকায় মজুদ করা হচ্ছে বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্য, অবৈধভাবে চলছে প্লাস্টিক, ফ্যান সহ নানা কারখানা। দেশজুড়ে ইটের ভাটা, বেশিরভাগই অবৈধ। সেইসাথে চলছে অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণ-অব্যবস্থাপনা।

এগুলোর কারণে ঢাকার বাতাস এখন বিশ্বে সবচাইতে বেশি দূষণের রেকর্ড করেছে। দেশজুড়ে পানি ও বায়ুদূষণ এসব অনিয়ন্ত্রিত 'উন্নয়ন' তৎপরতার অন্যতম পরিণতি। ডেঙ্গু, শ্বাসকষ্ট, কিডনি-ফুসফুস-হৃদযন্ত্র জটিলতা সহ নানা অসুখ মানুষের জীবনকে অনিশ্চিত, দুর্বিষহ করে তুলছে। রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমছে মানুষের। তাই করোনা ছাড়াই দেশের অসংখ্য মানুষ অকালমৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে দিন পার করছেন। সরকার এর সাথে বিপুল উৎসাহে একের পর এক কয়লা আর পারমাণবিক প্রকল্প করছে যার ভয়ংকর পরিণতি চিন্তা করাও কঠিন। সুন্দরবন বিনাশেও সরকারের একগুঁয়েমি চলছে। প্রাথমিক বর্জ্য-ব্যবস্থাপনায় ক্ষমার অযোগ্য ব্যর্থতা থাকলেও আরও ভয়াবহ বর্জ্য-বান্ধব কয়লা ও পারমাণবিক কেন্দ্র ভিত্তিক 'উন্নয়নের' পথে যেতে তার কোনো দ্বিধা নেই।

তাই উন্নয়নের মহাসড়কের গল্প শুনতে শুনতে ক্লান্ত হলেও আমরা দেখছি সর্বজন হাসপাতালে দুরবস্থা, সরঞ্জাম নেই, বাজেট নেই, পর্যাপ্ত শয্যা নেই, আইসিইউ হাতেগোনা। বিনা চিকিৎসায় মানুষ মরছে।

বাংলাদেশে করোনা: চিকিৎসা ও খাদ্যসংকট

১৬ কোটি মানুষের বাস এই বাংলাদেশে। কিন্তু ভাইরাসের পরীক্ষা হয়েছে খুব ধীরগতিতে, প্রথম দিকে খুবই কম ছিল, এখন সর্বোচ্চ দিনে ১৬ হাজারে পৌঁছেছে। শোনা যায় পরীক্ষা করার সক্ষমতা আছে ৩০ হাজার। পরীক্ষায় সরকারের আগ্রহ কম। সেজন্য গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র র‍্যাপিড টেস্ট নিয়ে অগ্রসর হলেও সরকার হয়তো সেকারণেই বিষয়টি অনুমোদন দিতে গড়িমসি করছে। একজনে ফেসবুক মন্তব্যে সঠিকভাবেই লিখেছেন, 'স্কুলে পরীক্ষা না হলে তো আর কেউ ফেল করে না। বাংলাদেশের সেই দশা।' ঢাকার বাইরে বহু জেলায় টেস্ট করার কোনো ব্যবস্থাই নেই।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত একাধিক খবরে শুধু নয় নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেও আমরা দেখছি, অনেকে লক্ষণ নিয়ে দিনের পর দিন চেষ্টা করেও টেস্ট করার সুযোগ পাচ্ছেন না। করোনা-লক্ষণ নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা যে বাড়ছে তার কিছু নমুনা প্রতিদিনের পত্রিকার পাতায় দেখা যাচ্ছে। লক্ষণ আছে কিন্তু সনাক্ত হয়নি, এরকম একটি ক্ষেত্রেও যদি করোনা ভাইরাস পজিটিভ হয়ে থাকে তাহলে এর সূত্রে কতজন বিপদ-আক্রান্ত হতে পারেন তা অনুমান করাও কঠিন। এই চিকিৎসায় ডাক্তার-নার্সদের ঝুঁকি সবচাইতে বেশি, কিন্তু তাদেরও সুরক্ষা ব্যবস্থা অপ্রতুল। সরকার সমর্থক ডাক্তাররা পর্যন্ত সাংবাদিক সম্মেলন করে এসব সামগ্রী নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন কিন্তু পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে খুব কম। এখন দেশে সরকারের বাইরে অনেকে উদ্যোগ নিচ্ছেন, চীন থেকে আমদানি হচ্ছে। এসব সামগ্রীতেও ভেজাল-প্রতারণার খবর বাড়ছে।

জানুয়ারি মাস থেকে এই অজানা ভাইরাসের বিপদ নিয়ে বিশ্বজুড়ে কথাবার্তা হলেও বাংলাদেশে সেভাবে প্রস্তুতি নেওয়া হয়নি। বেশি আক্রান্ত দেশগুলো থেকে আসা ব্যক্তিদের জন্য কোয়ারেন্টাইন, রোগীদের জন্য আলাদা হাসপাতাল, আইসিইউ প্রস্তুত করা এগুলো খুবই অগোছালো ও সমন্বয়হীন ছিল । বরং প্রথম থেকেই সমস্যাটি অস্বীকার করার প্রবণতা এবং সরকারের মন্ত্রীদের হাস্যকর আত্মপ্রসাদের বাণীর কারণে যতটা প্রস্তুতি নেয়া সম্ভব ছিল সেই কাজের গতিও মন্থর হয়েছে। এই দুর্বলতা প্রকট হবার কারণে যখন প্রয়োজন ঘাড়ের ওপর এসে

পড়েছে তখন তথ্য চেপে রাখা, নিয়ন্ত্রণ করা, ভয়ভীতি দেখানোর ক্ষেত্রে সরকারের সক্রিয়তা বরং আরও বেশি দেখা গেছে।

দুনিয়া জুড়ে করোনা ভাইরাস ছড়াবার প্রাথমিক সময় ছিলো জানুয়ারি মাস। তখন থেকেই সরকারি বক্তব্য শুনেছি যে, করোনা মোকাবিলায় বাংলাদেশে সকল প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। অথচ আড়াই মাস পরেও দেখা গেছে দেশের বড় বড় হাসপাতালেই এসব রোগী আলাদা করে রাখার কোনো ব্যবস্থা নেই। ডাক্তার-নার্সদের সুরক্ষা পোশাক নেই। রোগ পরীক্ষার কিট নেই। মার্চ মাসের শেষের দিক থেকে পরীক্ষা কিট, সুরক্ষা পোশাক বিদেশ থেকে আসতে শুরু করে। দেশের মধ্যেও এগুলো তৈরির বিভিন্ন উদ্যোগ দেখা যায়। তবে রোগ পরীক্ষা খুব সীমিত ও নিয়ন্ত্রিতই থেকেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বারবার বলেছে ব্যাপক সংখ্যায় পরীক্ষা করতে, কারণ পরীক্ষা না করলে তো বোঝাও যাবে না, ব্যবস্থাও নেয়া যাবে না। সেখানেই বাংলাদেশের বড় ঘাটতি। পুরো চিকিৎসা ব্যবস্থাই ভেঙে পড়েছে। পরিস্থিতি এমন যে, অন্যান্য অসুখেও রোগীদের চিকিৎসা পাওয়া এখন খুবই দুরূহ।

চিকিৎসা-সংকটের পাশাপাশি ভয়াবহভাবে তৈরি হয়েছে কর্মহীনতা ও অনাহারের সংকট। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সরকারি ঘোষণায় বন্ধ হয়েছে ১৭ মার্চ থেকে। আরও বহু প্রতিষ্ঠানে কার্যক্রম তখন থেকেই সীমিত করে ফেলা হয়। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। রাস্তাঘাটে চলাচল কমে যায়। পরিবহন শ্রমিক, দোকান শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, হকারসহ ক্ষুদে ব্যবসায়ীরা বেকার হয়ে পড়েন। ২৬ মার্চ থেকে কারখানা ও সীমিতভাবে ব্যাংক বাদে সকল প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়। বাস, লঞ্চ, ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যাবার মুখে লক্ষ লক্ষ বেকার মানুষ গ্রামের দিকে রওনা হন। গ্রামে না গিয়ে তাঁরা কী করবেন? ঢাকায় তাঁদের থাকার ব্যবস্থা এমন নয় যে, তাতে করোনা থেকে বাঁচার মতো করে থাকা যাবে। ঢাকায় থাকলে শরীর অসুস্থ হলে যে চিকিৎসা হবে তা-ও নয়, ঢাকায় থাকলে যে খাবারের সংস্থান হবে তা-ও নয়। তাহলে কেন ঢাকায় থাকবেন তাঁরা? যারা থেকে গেলেন ঢাকায় তাদের রাস্তায় চলাচল করতে হয়, দোকান বা হাসপাতাল বা কাঁচাবাজারে যেতে হয়। কিন্তু প্রথমদিকে নির্বিচারে রাস্তায় চলাচল বন্ধ করতে পুলিশ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের তৎপরতা ছিল আক্রমণাত্মক। তাদের আক্রমণের শিকার হন বৃদ্ধ ভ্যানচালক থেকে তরুণ ডাক্তার পর্যন্ত। সরকার-বেসরকার থেকে বেতার-টেলিভিশনে লিফলেটে-মাইকে বলা হতে থাকে সবাইকে ঘরে থাকতে, নিরাপদ দূরত্বে থাকতে। কিন্তু সমস্যা দাঁড়ায় বহু মানুষের বাসস্থান এমন সব স্থানে, রাস্তায়, রেললাইনের ধারে, বস্তিতে যেখানে তারা কীভাবে এসব শর্ত পূরণ করবে তার কোনো নির্দেশনা সরকারের কোনো প্রতিষ্ঠান থেকেই আসেনি। বা সরকারি দল ও অগণিত শাখা-সংগঠনের এত এত লোকজন তাদেরও কোনো তৎপরতা দেখা যায়নি।

বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবন কেমন, কেমন তার থাকা, খাওয়া, খেলা, কাজ আর রাষ্ট্রের বা সর্বজনের অর্থ কোথায় যায় তা নিয়ে ফেসবুকে গবেষক মাহা মির্জা যা লিখেছেন তাতেই সারকথা পাওয়া যায়:

> "কুড়িল বস্তির কথা মনে পড়লো। খালের পাড়ে সারি সারি বাঁশের ঘর। ওইটুকু জায়গায় কত মানুষ রোজ ঢোকে, বের হয়। গায়ে গা লাগিয়ে মানুষ বাঁচে। ডাম্প করা ময়লার স্তূপে বাচ্চারা খেলে। আরবান এলিটদের নাক সিঁটকানি দেখি আর অবাক হই। তারা উপদেশ দেয়, এই জাতি নোংরা, খারাপ, থুথু ফেলার হ্যাবিট। মানলাম। কিন্তু থুথুর মধ্যে, কফের মধ্যে, আপনার ইউরেনাল লাইনের উপরে, খোলা পায়খানার কয়েক গজের মধ্যে একটা মধ্য আয়ের দেশের কত লক্ষ মানুষ জীবন যাপন করতে বাধ্য হয় বলেনতো? এলিয়েন তো নয়, আপনারই সার্ভিস প্রোভাইডার। আপনার ঠিকা বুয়া, সিঁড়ি মোছার বুয়া, সকালবেলার হকার। প্রতিদিন আলু-টমেটো সরবরাহ করা ভ্যানওয়ালা। আপনারপ্লাম্বার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, ডিশের লাইন ঠিক করতে আসা অল্পবয়সী ছেলেটা? কই থাকে? গুরুত্বপূর্ণ সার্ভিস দেয়া এতগুলো মানুষ কেন এমন গায়ে গা লাগিয়ে ইতরের জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়, এই প্রশ্নটা করেননা কেন? কারণ এই প্রশ্নটা করলে সিস্টেমে

ধাক্কা লাগবে। আপনার পোষাবেনা। আচ্ছা, এই প্রশ্নটা করেন-না কেন, সামিট গ্রুপকে বসিয়ে বসিয়ে ২ হাজার কোটি টাকার বিল দেয়া যায়, এস-আলম গ্রুপকেতিন হাজার কোটি টাকা ট্যাক্স মওকুফ করে দেয়া যায়, কিন্তু সারাবছর হাড়ভাঙা খাটুনি খাটা গার্মেন্টসের মেয়েগুলোকে স্ববেতনে ছুটি দেয়া যায়না কেন? প্রশ্ন করেনতো, ঢাকা-মাওয়া রুটের নির্মাণকাজে ইউরোপের ৩ গুণ বেশি খরচ হয়ে যায়, অথচ একটা আইসিউ বেডের জন্যে, একটা ভেন্টিলেটরের জন্যে প্রতিদিন শত শত মানুষ এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে পাগলের মতো ছোটে কেন? বিশ্বের সর্বোচ্চ খরচের ফ্লাইওভারের দেশে প্রতি ১০০০ জন রোগীর জন্যে মাত্র ১টা হাসপাতাল বেড কেন? আমরা মজুদ করেছিলাম কম্যাট ফাইটার্স, এয়ার মিসাইল সিস্টেম, মিগ ২৯। এখন আমাদের ফ্রন্টলাইনের চিকিৎসকরা হাহাকার করছে, মাস্ক নাই, কিট নাই, বেড নাই, আইসিইউ নাই। প্রায় দুই মাসের মতো অমূল্য সময় পাওয়ার পরেও আমাদের হাসপাতালগুলো আনপ্রোটেক্টেড কেন? প্রয়োজনীয় গ্লাভস, মাস্ক, স্যানিটাইজার, আর টেস্টিং কিট মজুদ করা গেলনা কেন? প্রশ্ন করেনতো, রাশিয়ার সঙ্গে আট হাজার কোটি টাকার আর্মস ডিল করা যায়, বেসরকারি বিদ্যুৎ খাতের বেহুদা লোকসান সামলাতে পাবলিক ফান্ড থেকে ৮ হাজার কোটি টাকার ভর্তুকিও দেয়া যায়, অথচ এমন ভয়ানক বিপদের দিনেও এই শহরের খেটে খাওয়া মানুষদের জন্যে ফ্রি-তে চাল-ডাল সরবরাহ করা যায়না কেন?"

বাংলাদেশে নিয়মিত বেতন ও মজুরি পেয়ে কাজ করেন এরকম মানুষ সংখ্যায় খুবই কম। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ স্বনিয়োজিত। আসলে টুকটাক অর্থনীতিই বাংলাদেশের প্রধান জনগোষ্ঠীর বেঁচে থাকার অবলম্বন। কেউ টুকরা ব্যবসা, কেউ এখানে-সেখানে কাজ করে, বহুতল ভবনে ঝুলে, ভদ্রলোকদের সেবা করে নিজেদের আয় খুঁজতে চেষ্টা করেন। কোনোটাই স্থায়ী নয়, কোনোটাই নিয়মিত নয়। সরকারের হিসাব অনুযায়ী, কৃষি শিল্প আর পরিষেবা খাতে প্রায় ৬ কোটি শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ৫ কোটি মানুষই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে অর্থাৎ যাদের নিয়মিত আয় নেই। যাদের জীবিকা নির্ভর করে প্রতিদিনের হাড়ভাঙা কাজের ওপর। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে আবার নারীর অনুপাত বেশি। করোনা ভাইরাসের আক্রমণে এই কোটি কোটি মানুষ এখন দিশেহারা। করোনা ছাড়াই তাদের জীবন বিপন্ন। এদের জন্য রাষ্ট্র কী ব্যবস্থা গ্রহণ করল? বস্তুত তেমন কিছুই না।

করোনাকালে প্যাকেজ

করোনা ভাইরাসে বিশ্বের কয়েকশো কোটি মানুষ যখন শুধু মৃত্যুভয় নয়, অনাহার আর দারিদ্র্যের ভয়াবহতার মুখোমুখি তখন বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন বিশেষ বরাদ্দ ঘোষণা করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের ভূমিকার র‍্যাংকিং করলে দেখা যায় বাংলাদেশ রাষ্ট্র সবচাইতে নীচের দিকে, তার নির্মম ও নির্লিপ্ত ভূমিকা সত্যিই বিস্ময়কর। এদেশে যে কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষ বাস করে তা রাষ্ট্রের কর্ণধারদের চিন্তার মধ্যে আছে বলেই মনে হয়নি।

পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে একটি চরম প্রতিক্রিয়াশীল সরকার ক্ষমতায়, সেখানেও প্রথমেই তিনমাসের জন্য তিন রূপী কেজি দরে চাল এবং দুই রূপী কেজি দরে গম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া চুক্তিবদ্ধ সব অস্থায়ী কর্মীদের পুরো মাসের বেতন দেওয়া হবে বলে বলা হয়েছে। এর বাইরে ভারতে বিভিন্ন রাজ্য সরকার নিজ নিজ অবস্থান অনুযায়ী আরও সমর্থন ঘোষণা করা হয়েছে। কেরালায় ২০ হাজার কোটি রূপীর কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে, যার অন্তর্ভুক্ত হল দরিদ্র নাগরিকদের স্বাস্থ্যসেবা, ঋণ, বিনামূল্যে খাদ্য, ভর্তুকিতে খাদ্য এবং বকেয়া পরিশোধ। পশ্চিমবঙ্গেও স্পষ্ট কিছু কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। চরম ব্যবসাবান্ধব ট্রাম্প প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রে ২ ট্রিলিয়ন (২ লক্ষ কোটি) মার্কিন ডলারের এক প্যাকেজ ঘোষণা করেছে যার একটা বড় অংশ বোয়িংসহ বৃহৎ ব্যবসায়িক গোষ্ঠীই পাবে। তবে সেখানেও কাজ হারানো বা আয় কমে যাওয়া মানুষদের কিছু সমর্থন দেবার বরাদ্দ আছে। নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্য এককালীন ১২০০ মার্কিন ডলার সহায়তা দেওয়া হয়েছে। পরে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা বাড়ানোও হয়েছে।

কিন্তু বাংলাদেশে করোনা সংকট মোকাবিলায় এরকম কর্মসূচি ছিল বিলম্বিত এবং খুবই দুর্বল। ২৫ মার্চ থেকে সরকারের একাধিক প্যাকেজে ভর্তুকি সুদে ঋণসহ প্রায় লক্ষ কোটি টাকার নানা প্রণোদনা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এসব প্যাকেজে সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্মহীন ও আশ্রয়হীন মানুষের খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। এককালীন অপ্রতুল ত্রাণ সরবরাহের যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় তাতেও দুর্নীতির অভিযোগ বাড়তে থাকে। সর্বশেষ নগদ টাকার ক্ষেত্রেও একই অভিযোগ উঠছে। সরকার যে কয়েকদফা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে তার প্রথমটি ছিল রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য। সেটা ঋণের প্যাকেজ, দুই শতাংশ সুদে/সার্ভিস চার্জে ঋণ। এগুলো সুনির্দিষ্ট করতেও সময় গেছে অনেক। যতটুকু বোঝা যায়, যারা করোনা-পূর্ব সময় থেকে ব্যাংকগুলোর ঋণসুবিধা পাচ্ছিল তারাই এবারেও ঋণ সুবিধা পাচ্ছে। সরকার বলেছে এই ঋণ দেওয়া হচ্ছে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা দেওয়ার জন্য। প্রশ্ন হল, শ্রমিকদের বেতন-ভাতা তো কারখানাগুলোর এমনিতেই দেওয়ার কথা। খুব কমদিনই উৎপাদন বন্ধ ছিল। যে অর্ডারগুলো বাতিল হচ্ছিল সেটা তো করোনার প্রথম দিকে। পরে অনেকে আবার বাতিল আদেশ থেকে পিছিয়ে এসেছে। এক-দুইমাসের বেতনও কেন তারা দিতে পারে না? একদিকে গার্মেন্টস মালিক, বিজিএমইএ, সরকার এবং অন্যদিকে ব্র্যান্ড ও বায়ার প্রতিষ্ঠানগুলোর ঠেলাঠেলির কারণে গার্মেন্টস শ্রমিকদের কয়েকদফা ঢাকা থেকে যাওয়া আবার আসায় মহাদুর্ভোগে পড়তে হল, যা করোনা পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করেছে। এই প্রণোদনা ঘোষণার পরও বকেয়া মজুরির জন্য শ্রমিকদের রাস্তায় দাঁড়াতে হয়েছে। গার্মেন্টস মালিকদের দাবিদাওয়া সরকারের কাছে সবসময়ই অগ্রাধিকার পায়, এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। প্রথম থেকেই ছাঁটাই নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক উদ্বেগ ছিল, ছাঁটাই হয়েছেও। মে মাসের শেষে বিজিএমইএ সভাপতি জুন মাসে আরও ব্যাপকভাবে ছাঁটাই হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন, তার বাস্তবায়নও আমরা দেখেছি। এভাবে ছাঁটাই থামানোর জন্য সরকার কিছুই করেনি। অন্যদিকে বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণখেলাপিদের জন্য সুবিধা ঘোষণা করেছে। কিন্তু যথারীতি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের প্রতি তাদের কোনো নজর নেই। 'এমপি' সাহেবদের যে বড় অংকের থোক বরাদ্দ দেয়া আছে সেগুলোও বর্তমান সংকটে কোনো কাজে লাগানোর ঘোষণা নেই।

পরের প্যাকেজে সাড়ে ৪ শতাংশ সুদে ছোট এবং মাঝারি শিল্পের জন্য ঋণ বরাদ্দের কথা বলা হয়েছে। কৃষকদের জন্যও ঋণের প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু তার যা শর্ত তাতে গরীব ও ক্ষুদ্র কৃষকেরা এর কোনো সুবিধা পাবেন না। তাছাড়া কৃষকদের অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো উৎপাদিত কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণ, যার ফলে কৃষিপণ্যের দাম নিয়ে অনিশ্চয়তা থেকেই যায়। করোনা-পূর্ব কালেও পরিবহন এবং বাজারজাতকরণের সমস্যায় কৃষকেরা বরাবরই ভুগেছেন। করোনাকালে পরিবহন বন্ধ থাকায় কৃষকদের ফসলের যুক্তিসঙ্গত দাম না পাওয়ার পুরনো সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করেছে। আরেকটা বিষয় হচ্ছে করোনাকালেই বোরো ধান তোলার মৌসুম আসে। সরকার কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ধান বা চাল কিনলে কৃষকদের একটা ভরসা থাকত, কিন্তু তাতেও শ্লথগতি। কৃষকদের নিজে বেঁচে থাকার জন্য এবং পরবর্তী উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কৃষি-উপকরণ, উৎপাদন খরচ যোগানো কঠিন হয়ে পড়ে। কৃষিমজুর যারা অন্য এলাকায় গিয়ে মৌসুমি মজুর হিসেবে কাজ করেন তাদের বেশিরভাগ এবারে কাজ করতে না পারায় কয়েকমাসের অনিশ্চয়তায় পতিত হলেন।

নাগরিকদের উদ্যোগে গঠিত 'দুর্যোগ সহায়তা মনিটরিং কমিটি' সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জন্য সরকারি কর্মসূচি পর্যালোচনার দায়িত্ব নিয়ে গত ৩০ এপ্রিল তার প্রথম রিপোর্ট প্রকাশ করে। ২৩ মে প্রকাশ করে তাদের দ্বিতীয় রিপোর্ট। কমিটি সরকারি দলিলপত্র ও পরিসংখ্যান ব্যবহার করে এই রিপোর্টে জানায় যে, ১৪ মে পর্যন্ত সারাদেশের ৬৪টি জেলায় মোট ১ লাখ ৬২ হাজার ৮শ ১৭ মেট্রিক টন চাল, ৭২ কোটি ৩৩ লাখ ৭২ হাজার ২শ ৬৪ নগদ টাকা এবং শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ ১৯ কোটি ১৪ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সরকারের চাল ক্রয় নীতিমালা অনুযায়ী ৩৬ টাকা কেজি ধরলে সর্বমোট বরাদ্দ টাকার হিসাবে ৬৭৭ কোটি ৬১ লাখ ৮৪ হাজার ২শ

৬৪ টাকা। দেশে বর্তমানে মোট দরিদ্র মানুষের মানুষের সংখ্যা ৪ কোটি ১৭ লাখ ৬৮ হাজার ৯শ ৪৫ জন। অর্থাৎ ১৪ মে পর্যন্ত মোট দরিদ্র জনসংখ্যার মাথাপিছু বরাদ্দ চাল, নগদ টাকা ও শিশুখাদ্য মিলিয়ে ১৬২.২০ টাকা। আর দরিদ্রতম এলাকায় মাথাপিছু বরাদ্দ আরও অনেক কম-- সর্বোচ্চ ৩২ টাকা, সর্বনিম্ন ৭ টাকা।

সর্বশেষ সরকার ৫০ লক্ষ গরিব মানুষের জন্য মাথাপিছু ২ হাজার ৫০০ টাকা প্রদানের জন্য ১ হাজার ২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। 'প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার' হিসেবে অভিহিত এই অর্থ নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের মোবাইল নম্বরে পৌঁছানোর কথা। কিন্তু এই বরাদ্দ নিয়েও দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। গরিবদের নামে টাকা আত্মসাৎ করার জন্য এক মোবাইল নম্বর দুশবারও দেয়া হয়েছে। যদি এই বরাদ্দ টাকা পুরোপুরি ঠিকভাবে বিতরণ হয় তারপরও দেশের গরিব জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দ মোট দাঁড়াবে ২ হাজার কোটি টাকার কম। মনিটরিং কমিটি পাশাপাশি তুলনা করে দেখিয়েছে দেশে বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বসিয়ে রেখে গত বছর ভর্তুকি দেয়া হয়েছে ৯ হাজার কোটি টাকা, একটি বেসরকারি কোম্পানির শুল্ক মওকুফ করা হয়েছে ৩ হাজার ১৭০ কোটি টাকা। দেশ থেকে প্রতিবছর পাচার হয় প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা।

করোনা ও মৃত্যুঃ সাম্যবাদী কিংবা বৈষম্যমূলক

'করোনা ভাইরাস হচ্ছে একটি সাম্যবাদী রোগ', এরকম কথা গত কিছুদিনে অনেকের মুখেই শুনেছি। কথাটা সত্য, তবে আংশিক। সত্য এই কারণে যে, কোভিট-১৯ নামের ভাইরাসের আক্রমণ দেশ, অঞ্চল, শ্রেণি, লিঙ্গ, জাতি, বয়স কোনোকিছুতেই ছাড় দিচ্ছে না। এই আক্রমণ সার্বজনীন– সকলেই এর শিকার। এর আগে আর কোনো ঘটনা বিশ্বের সকল প্রান্তের সকল মানুষকে এভাবে আতঙ্কিত এবং অস্থির করেনি। আর কোনো ঘটনা এভাবে বিশ্বের সকল প্রান্তের অর্থনীতিকে বসিয়ে দেয়নি। আর কোনো ঘটনা পুরো বিশ্বকে কখনো এভাবে থামিয়ে দিতে পারেনি। এমন কোনো মানুষ নেই যিনি ক্ষমতা বা বিত্তের জোরে বলবেন যে, এতে তার কোনো ভয় নেই। এই ভাইরাস তাই মৃত্যুর মতোই সাম্যবাদী।

তবে ভাইরাসের মতো মৃত্যুর ক্ষেত্রেও সাম্যবাদী কথাটা আংশিক সত্য। করোনা হোক বা না-হোক মৃত্যু অনিবার্য, সবার জন্যই। ক্ষমতা, বিত্ত, গায়ের রং, ভাষা, লিঙ্গ, অঞ্চল, পেশা, পাপী-পরহেজগার, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী কোনোকিছুই মৃত্যুকে ঠেকাতে পারে না। কিন্তু মৃত্যুও কি সবার কাছে একইভাবে আসে? একজন ব্যক্তির মৃত্যু স্বাভাবিক হতে গেলে জীবনও স্বাভাবিক হতে হয়। কোনো জনপদে জীবন যদি অসম্মান, নিরাপত্তাহীনতা, অধিকারহীনতা আর অনিশ্চয়তায় জর্জরিত থাকে তাহলে মৃত্যু কীভাবে স্বাভাবিক হবে?

বাংলাদেশে প্রতিবছর অসংখ্য অকাল অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। সড়ক ঠিক না রাখা, পরিবহন ফিটনেস না দেখা, চালকদের যথাযথ জীবন নিশ্চিত না করার কারণে প্রতিদিন সড়কে মানুষ মরে, বছরে তা ৫ থেকে ৭ হাজারে পৌঁছে। সীমান্ত-হত্যা, ক্রসফায়ার, হেফাজতে নির্যাতনে মরছে মানুষ নিয়মিত। দেশে পানিদূষণে, বায়ুদূষণে, ফল-ফসল-মাছে বিষের কারণে ফুসফুস- কিডনিসহ শরীরযন্ত্র আক্রান্ত হচ্ছে, জটিল অসুখ হচ্ছে, ব্যয়বহুল চিকিৎসায় বেশিরভাগ মানুষের প্রবেশাধিকার নেই, তাই অকালে মরছে মানুষ। সন্তান ধারণসহ নানা জটিলতা ছাড়াও নির্যাতনে, ধর্ষণে নারীর মৃত্যু প্রায়দিনের খবর। আর্থিক কারণে চিকিৎসা না পেয়ে বা ভুল চিকিৎসায় কতো মানুষ মারা যাচ্ছে তার খবর পেতে চাইলে প্রতিদিনই পাওয়া যাবে। কারখানা-বস্তিতে আগুন, কর্মস্থলে, পথেঘাটে নির্যাতন ইত্যাদিতে বহুজনের মৃত্যু ঘটছে প্রতিনিয়ত। নির্মাণকাজসহ নিরাপত্তাহীন ঝুঁকিপূর্ণ কর্মস্থলে কাজ করতে গিয়ে বহু মানুষ মরে প্রতিবছর। তার মানে মৃত্যু অনিবার্য হলেও সবদেশে সবার জন্য তার রূপ, সময়, অনিশ্চয়তা একরকম নয়। শান্তি ও সম্মান নিয়ে জীবন শেষ করা সব মানুষের অধিকার। বাংলাদেশে কজন মানুষ সেই সুযোগ পান? এদেশে তাই মৃত্যুভয়ও যেনো একটা বিলাসিতা। এতভাবে এদেশে অকাল মৃত্যুর পথ তৈরি আছে যে, আলাদা করে কোনো মৃত্যুভয়েরও সুযোগ থাকে না।

করোনা রোগ সবাইকে ধরতে পারে ঠিকই কিন্তু সবার জন্য সমান পরিণতি আনে না। এই মুহূর্তে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভয়, করোনার চাইতেও বেশি, ক্ষুধা আর কাজ হারানোর। যারা বাংলাদেশে দূষিত বায়ু আর পানির সাথে দিনরাত জীবন যাপন করেন, যথাযথ পুষ্টিলাভ যাদের সাধ্যের বাইরে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকা এবং কাজ করা ছাড়া যাদের উপায় নেই, তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এমনিতেই অনেক কম, তাদের ফুসফুস কিডনি আগে থেকেই দুর্বল। তাই তাদের ধরা যেকোনো রোগের জন্য খুব আরামের বিষয়। শারীরিক পরিশ্রম, রোদে পোড়াসহ কোনো কারণে করোনা তাদের অনেককে ধরতে না পারলেও অন্য বহু অসুখ তাদের ধরতে ওৎ পেতে থাকে। কোনো অসুখেই তাদের জন্য চিকিৎসা পাওয়া সহজ নয়, আর করোনার চিকিৎসা দূরের কথা টেস্ট করারও সুযোগ তাদের জন্য দুর্লভ।

করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পাবার প্রধান পথ জনবিচ্ছিন্নতা, স্বেচ্ছাবন্দিত্ব: 'ঘরে থাকুন, নিরাপদে থাকুন'। এই সময়ে এই শর্ত পূরণ করতে গিয়েই উদাম হল বাংলাদেশের আসল চেহারা। সবার জানা থাকার কথা তারপরও এবারই যেন অনেকের নজরে এল যে, বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের পক্ষে এসব শর্ত পূরণ করা সম্ভব নয়। তাদের অনেকের জন্যই বাছাই করতে হচ্ছে হয় করোনা না হয় ক্ষুধা। ঘর নেই এরকম মানুষ ঢাকা শহরেই অনেক পাওয়া যায়। রেললাইনের ধারে গাদাগাদি করে থাকে হাজার হাজার মানুষ। বস্তি, বারবার আগুন দিলেও, এখনও লক্ষ লক্ষ মানুষের বাস। সেখানে ছোট এক ঘরে ৪/৫ থেকে আরও বেশিজনও থাকেন। আগেই বলেছি, দেশের প্রায় ৫ কোটি মানুষ যেভাবে বেঁচে থাকার সামগ্রী সংগ্রহ করেন তার কোনো স্থায়ী, স্থিতিশীল, নিয়মিত রূপ নেই। যখন যেমন পাওয়া যায়, দিনের কাজে দিনের চলা, টুকটাক কাজ। প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক হিসেবে যাদের নিয়মিত মজুরি পাবার কথা সেই গার্মেন্টস শ্রমিকেরাই করোনা-সংকটকালে যখন বকেয়া মজুরি, ছাঁটাই, পুলিশ-মাস্তানের আক্রমণ ইত্যাদির মুখে দিশেহারা থাকেন তখন অন্য বহুরকম ছোট কারখানা, দোকান, পরিবহন শ্রমিকদের অবস্থা যে আরও সঙিন তা ব্যাখ্যা করে বোঝানোর দরকার নেই। করোনা-আতঙ্ক, আর তা প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থাবলি দুটোই তাই এই আধমরা মানুষদের আরও শুইয়ে দিচ্ছে।

করোনা থেকে বাঁচতে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে ঘরে আটকে থাকা একটা বড় মানসিক এবং শারীরিক চাপ। কিন্তু ঘরে থাকার মতো ঘর থাকা, ঘরে আটকে থাকা অবস্থায় খাবার থাকা, এতদিন প্রতিষ্ঠান বন্ধ/ছুটি থাকলেও নিজের আয় নিশ্চিত থাকা যে কতবড় সৌভাগ্যের ব্যাপার যাদের এগুলো নেই তারা তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেন। করোনার প্রভাব তাই সমাজের বিভিন্ন অংশের ওপর বিভিন্ন রকম। অনেক ব্যবসাও বসে পড়বে, অনেক উদ্যোক্তা পুঁজি হারাবেন, আবার অনেক ব্যবসায়ী মুনাফা করবেন, অনেকে সরকারের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে ক্ষতি পুষিয়ে আরও বেশি লাভ করবেন। বেকারত্ব বাড়বে, আর দিন এনে দিন খাওয়া অপ্রাতিষ্ঠানিক লোকজন, যদি বেঁচে থাকেন, আরও অপুষ্ট, অসুস্থ, ঋণগ্রস্ত হবেন। সমাজে বাড়তে থাকা বৈষম্য আরও বাড়বে।

তাই সব দেশে, সব সমাজে, সব শ্রেণিতে করোনা ভাইরাসের ফলাফল একরকম হবে না। কার ওপর এর প্রভাব কীরকম পড়বে তা নির্ভর করে তাদের করোনা-পূর্ব অবস্থা কী ছিল তার ওপর। তিনটি দিক এক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, যে দেশে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্ত, অর্থাৎ যেখানে নাগরিকেরা রাষ্ট্রের একটা নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে বাস করেন তাদের চাইতে যাদের নিরাপত্তা বলয় দুর্বল তাদের অবস্থা অধিকতর খারাপ। দ্বিতীয়ত, যে দেশ মুনাফা-ব্যক্তিব্যবসার বাইরে রেখে তার সর্বজনের বা পাবলিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা যতবেশি দক্ষভাবে দাঁড় করাতে পেরেছে সে দেশ ততো নাগরিকদের স্বাভাবিকসময়ে যেমন এরকম সংকটকালেও তেমন সুরক্ষা দিতে পারছে। বাংলাদেশ স্বাধীনতার ৫০ বছরের মাথায় এটাই স্পষ্ট করেছে যে, তার নাগরিকদের কথিত 'সামাজিক নিরাপত্তা জাল' শতচ্ছিন্ন, খুবই দুর্বল। আর এই দেশ সর্বজন স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা থেকে অনেক দূরে গিয়ে এটাকেও

একটা ব্যবসার ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। তৃতীয়ত, যেদেশ যতোবেশি পরিবেশবিধ্বংসী 'উন্নয়নের' অন্ধ যাত্রায় সক্রিয় থাকে সেদেশের মানুষ ততোবেশি নিরাপত্তাহীন থাকেন। বাংলাদেশে সেই যাত্রাই চলছে।

এই তিন কারণে বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বে সবচাইতে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি। কিন্তু যে বৈশ্বিক ও জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নদী-বন-বাতাস-প্রাণপ্রকৃতি বিনষ্ট, যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ কিন্ত দুর্বল মানুষেরা আজ মহাবিপদে, সেই একই প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছল মানুষেরাও শেষ পর্যন্ত নিরাপদ থাকতে পারেন না। কারণ দেশের সংকটে বিদেশে চলে যাওয়া বা অন্য দেশে চিকিৎসা তার কোনো পথই এখন খোলা নাই। যেকোনো অসুখবিসুখ নিয়ে ভিআইপি ক্ষমতাবানদের উদ্বেগ কম থাকে, দেশের চিকিৎসাব্যবস্থার হাল নিয়ে তাঁদের কখনো বিকার হয় না। কারণ তাঁরা সবসময়ই প্রস্তুত থাকেন যেকোনো অসুখ হলে বিদেশ চলে যাবেন। তারও কোনো উপায় এবার বেশ কয়েকমাস ছিল না। পৃথিবী একটাই, সংকটও এখন বিশ্বায়িত। কাজেই পায়ের নিচের মাটি ঠিক করতেই হবে।

'আল্লাহ ভরসা' এবং অপরাধীদের পরিচয়

'আমাদের আর কী হবে? আল্লাহই বাঁচাবে, মরণ আসলে কি আর বাঁচাতে পারবে কেউ?' এরকম কথা অনেকের মুখেই শোনা যায়, কিন্তু সবাই একই কারণে বলেন না। শ্রমজীবী মানুষ যাদের দিন এনে দিন খেতে হয়, বাইরে না-বের হলে না-খেয়েই মরার অবস্থা যাদের, বর্তমান সংকটকালে বুকে বল আনার জন্যই তাঁরা এইধরনের কথা বলেন। প্রকৃত চিত্র তুলে ধরলে, বা তাঁদের বিকল্প ব্যবস্থার কিছু উপায় দিতে পারলে তাঁরাও নিয়মকানুন মেনে চলবেন। কিন্তু সংকটকালে সরকারসহ কারও ওপর যদি ভরসা করা না যায় তাহলে নিজ জ্ঞান/কা-জ্ঞান আর আল্লাহ ভরসা ছাড়া মানুষেরই-বা আর কী করার থাকে?

তবে মানুষের এই অসহায়ত্বের সুযোগও নেয় অনেকে, বিশেষত অপরাধীরা। যখন ঝড় জলোচ্ছাসে দুর্বল মানুষেরা মরতে থাকে অরক্ষিত থাকার কারণে, কিংবা সড়ক-লঞ্চ 'দুর্ঘটনা'য় শত হাজার মানুষ মরে সড়ক, পরিবহন ইত্যাদিতে ভুল নীতি আর মহা লুটপাটের কারণে, খুনি-ধর্ষকদের অবাধ রাজত্ব তৈরি হয় সমাজে ক্ষমতাবানদের কারণে, এই সময়গুলোতে কিছু লোক পাওয়া যায় যারা উঁচু গলায় বলে, 'এগুলো আল্লাহর গজব', 'পাপের শাস্তি'। অথচ এসব কথায় কোনো বিবেচনা থাকে না যে, কে পাপ করল আর মরল কে? পাপ তো বটেই, যে উন্নয়ন-ধারা মানুষের জীবন ও জীবিকা বিপন্ন করে তা তো পাপই, তার জন্য যে বিপদ নেমে আসে তা তো গজবই। কিন্তু যাদের কারণে দেশ ও মানুষ অরক্ষিত, যাদের লোভ আর লাভের কারণে সড়কে প্রতিবছর কয়েক হাজার মানুষ মরে, যাদের কারণে দেশের নদী বন নষ্ট বা উধাও হয়ে সারাদেশের মানুষ আরও বেশি অসুস্থ আরও বেশি নাজুক হয়ে যাচ্ছে, যাদের কারণে নারী-শিশু নিরাপত্তাহীন সেই তারা তো মহা আরামেই থাকে, তারা নিয়মিত হারাম টাকা উপার্জন করলেও এদের বিরুদ্ধে কখনো বুলন্দ আওয়াজ শোনা যায় না। তারা নিয়মিত দোওয়াও কিনতে থাকে। অন্যদিকে গজব পাপ বলে মানুষকে তাদের দুর্ভোগের কারণ বুঝতে দেওয়া হয়না, রক্ষা করা হয় দুর্বৃত্তদের।

করোনা নিয়েও এরকম কথা শোনা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, এটা অমুসলমানদের উপর আল্লাহর গজব, এতে মুসলমানদের কোনো ক্ষতি হবে না। সৌদি আরবে মসজিদ বন্ধ দীর্ঘদিন, ইরানে হাজার হাজার মানুষ আক্রান্ত, বিভিন্ন দেশে মৃতদের মধ্যেও আছেন অনেক মুসলমান। তারপরও এসব মানুষবিদ্বেষী ভ্রান্ত কথাবার্তা চলছেই। আর বিশ্বে আজ যে ভয়াবহ মারণাস্ত্র গবেষণায় আকাশ বাতাস পানি জমিন বিপর্যস্ত, যে পারমাণবিক বর্জ্য আর ইলেকট্রনিক বর্জ্যে মানুষের বিপদবৃদ্ধি সেই উন্নয়ন বা সেই মুনাফার আর ক্ষমতার উন্মাদনার মধ্যে যারা কর্তা তাদের মধ্যে যেমন বিশ্বাসী আছে, তেমনি আছে অবিশ্বাসী; আছে ইহুদি, খ্রিস্টান, হিন্দু, মুসলমান সবাই, তারা দুনিয়ার মানুষের ১ শতাংশ। আর যারা বিপদে, যারা বিপন্ন মানুষ, তাদের মধ্যেও বিশ্বাসী আছে, আছে অবিশ্বাসী;

আছে ইহুদি, খ্রিস্টান, হিন্দু মুসলমান, আর তারাই দুনিয়ার মানুষের ৯৯ শতাংশ। ধর্ম বা বিশ্বাস দিয়ে যেমন পাপী বা নিপীড়কদের ভাগ করা যায় না তেমনি ভাগ করা যায় না মজলুম মানুষদেরও। আর শুধু মানুষই নয়, বর্তমান মুনাফা উন্মাদ বিশ্বযাত্রার শিকার জগতের সকল প্রাণ।

করোনা ভাইরাসের যথাযথ ওষুধ এখনও আবিষ্কার হয়নি, কাজ করছেন অনেকেই। তবে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলেও যথাযথ চিকিৎসা-সমর্থন পেলে কমপক্ষে শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি মানুষ বেঁচে যেতে পারেন। এই সমর্থনের জন্য যে চিকিৎসা অবকাঠামো দরকার তা বাংলাদেশে নেই বলে ব্যাপক হারে এই ভাইরাসের আক্রমণে আমাদের ঝুঁকি অনেক বেশি। তার সাথে কাজ আর খাদ্য সংকট। এখনও করোনা রোগে আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে, মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়ছে। আক্রান্ত হলে বেশিরভাগ মানুষের চিকিৎসার সুযোগ নেই, বিনা চিকিৎসায় কতজন মরছেন তার হিসাব নেই, সুস্থতার হার অন্য বহুদেশের তুলনায় অনেক কম। অনাহার-অনিশ্চয়তার ভয় কোটি কোটি মানুষের মধ্যে।

করোনা সংকটঃ আশু থেকে দীর্ঘমেয়াদে করণীয়

করোনা-সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকটের বিভিন্ন মাত্রা আছে। এর মোকাবেলায় করণীয়গুলোকে আশু বা স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি, দীর্ঘমেয়াদি এভাবে ভাগ করে কর্মসূচি হাতে নেয়া দরকার ছিল। করোনা সনাক্ত হবার পরই সরকারের আশু করণীয় ছিল ব্যাপক সংখ্যক মানুষের জন্য কয়েকমাসের বেঁচে থাকার অর্থ/সামগ্রী জোগান দেওয়ার ব্যবস্থা করা। তিনমাস পরেও সেই কর্মসূচি নেয়া হয়নি। তবে সরকার ও তার বাইরে বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তি/গোষ্ঠী থেকে এককালীন ত্রাণসামগ্রী বিতরণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়েছে।

করোনাভাইরাসের সংকটের কারণে বিশাল সংখ্যক মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। আগেই বলেছি, সরকারি হিসাবেই প্রায় চার কোটি মানুষ আগে থেকেই দারিদ্র্যসীমার নিচে, তাদের অনাহার, আশ্রয়ের সমস্যা তো ছিলই। করোনায় যখন সব কাজ বন্ধ হয়ে গেল তখন তাদের মৃতপ্রায় দশা। তাদের সাথে এখন যোগ হয়েছে প্রান্তিক সীমার দরিদ্ররা, তাতে প্রায় ৮ কোটি মানুষ খাদ্যসংকটে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের মানুষদের তো এমনিতেই সার্বক্ষণিক অনিশ্চয়তায় থাকতে হয়। পরিবহন শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, বিভিন্ন ধরনের কারখানা শ্রমিক, কৃষিমজুর, দিনমজুর, গৃহশ্রমিক, হকারসহ যাদের অস্থায়ী বা খ-কালীন বা অনিয়মিত কাজ তাদের জন্য পরিস্থিতি খুবই সঙিন। গার্মেন্টস সহ বিভিন্ন কারখানা প্রাতিষ্ঠানিক খাত হলেও শ্রমিকদের জন্য তা এখনও অনিশ্চয়তায় ভরা। ছাঁটাই হচ্ছে যখন তখন, অনেকের কাজ থাকলেও মজুরি নেই, বকেয়াও পড়ে আছে অনেক। নিয়মকানুন না মেনে অনেকের ছাঁটাই-এর হুমকিও আছে। করোনাকালেও বকেয়া মজুরির জন্য বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকদের বারবার রাস্তায় আসতে হচ্ছে। শুধু শ্রমিক নয়, ব্যাংক-বীমা-মিডিয়াসহ বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মী-পেশাজীবীদের জন্যও অনিশ্চয়তা কম নয়। তাদের ক্ষেত্রেও ছাঁটাই, বকেয়া বেতন, বেতন কর্তনের অভিযোগ শোনা যাচ্ছে প্রায়ই।

আগেই বলেছি, কোভিড ১৯ সংক্রমণ পৃথিবীব্যাপী প্রকাশ হতে শুরু করেছে জানুয়ারি মাস থেকে। শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা কিংবা লকডাউন এগুলো এই ভাইরাসকে মোকাবেলার পথ হিসেবে এখন সর্বজনস্বীকৃত। এসব নিয়ে বাংলাদেশে ধারণা ছিল না, থাকার কথাও না। কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক বৈশ্বিক মহামারি ঘোষণা করার পরেই যেটা দরকার ছিল-- বিভিন্ন সম্ভাবনা বিচার-বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন মেয়াদে সামগ্রিক পরিকল্পনা করা। কেননা যদি লকডাউন পর্যন্ত যেতে হয় তাহলে বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠী যে কর্মহীন হবে এটা বোঝা কঠিন ছিল না। তাছাড়া মানুষকে স্বেচ্ছাবন্দিত্বে রাখতে গেলে তাদের থাকার জায়গাও দিতে হবে। বাংলাদেশে ফুটপাতে,

রেললাইনের ধারে বহু মানুষ থাকে, বস্তিতে ছোট ঘরে পাঁচ-দশ জন মানুষ থাকে। থাকার মতো ঘর নেই, আবার থাকলেও কাজ বাদ দিয়ে ঘরে থাকতে হলে খাবার নেই। হিজড়া, যৌনকর্মী, বেদে, দলিতসহ ভাসমান জনগোষ্ঠীর বেঁচে থাকার সংকট আরও প্রকট। তাই জনগোষ্ঠীর একটা অংশের জন্য আশ্রয়ের এবং বৃহৎ অংশের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা এ দুটো বিষয় নিশ্চিত করেই লকডাউন, পরিবহন বন্ধ, 'সাধারণ ছুটি' ইত্যাদির মধ্যে যাওয়া উচিত ছিল। শর্তপূরণ না করে বা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করে ঘরে থাকতে বলার কারণেই সেটা কার্যকর হয়নি। এসব ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কোনো কাজে আসে না। কারণ বাংলাদেশে এখন এমন অনেক লোক আছে, যারা জেলে যেতে পারলেও খুশি হবে। জেলে গেলে তবু খাবার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে!

বৈশ্বিক মহামন্দার মুখে যখন রপ্তানি খাত ঝুঁকির মুখে তখন অভ্যন্তরীণ বাজারের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ছোট-বড়-মাঝারি শিল্পের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, আরও বড় ভূমিকা কৃষির। তার মানে মহামারি-উত্তর দেশে অভ্যন্তরীণ বাজারের সাথে যুক্ত শিল্প বা কৃষি যাতে সক্রিয় ও বিকশিত হতে পারে তা নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। সেইসাথে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের মানুষেরা যাতে ঠিকঠাকভাবে কাজে ফিরতে পারেন সেজন্য পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। অনেকে এনজিও ঋণের উপর নির্ভরশীল, এ বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত পরিষ্কার হওয়া দরকার। এসব ঋণের কিস্তি এখন বন্ধ রাখতে হবে, সুদের হার অবশ্যই কমাতে হবে এবং সুলভ করতে হবে। আর ব্যাংকগুলোর গতিশীলতা আনতে বিদেশে সম্পদ পাচার করার অবাধ প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে। সামনে রেমিটেন্স ও রপ্তানি আয়, বাংলাদেশের অর্থনীতির দুই খুঁটি, কমে যাবে। এই পরিস্থিতিতে ঋণখেলাপিদের প্রতি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা যদি বন্ধ না-হয়, সম্পদ পাচার যদি বন্ধ না হয়, তাহলে বাংলাদেশে যে অর্থনৈতিক সংকট করোনার আগেই দানা বাঁধছিল তা আরও কঠিন অবস্থার দিকে যাবে।

সব দেশে জনগোষ্ঠীর বিশাল অংশ একইমাত্রায় ক্ষুধা, অনিশ্চয়তা আর অভূতপূর্ব বিপদের মধ্যে পতিত হয়নি, বাংলাদেশে হয়েছে। কারণ বিশ্বজুড়ে বহু দেশের সামাজিক নিরাপত্তার বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রতিটি নাগরিকেরই প্রাপ্য থাকে, যেমন-- খাদ্য, ন্যূনতম আয় বা বেকারত্ব ভাতা, চিকিৎসা ইত্যাদি। এদেশের নাগরিকদের জন্য এসব সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণই করা হয়নি কখনো। একসময় রেশনিং প্রথা ছিল সেটাও বিশ্বব্যাংক গোষ্ঠীর পরামর্শে তুলে দেওয়া হয়েছে। 'সোশাল সেফটি নেট' বলে যেটি চালু আছে তা সামাজিক নিরাপত্তা নয়।

করোনাকালে নাগরিকদের উদ্যোগ ও সুপারিশ

যে দেশে 'স্বাভাবিক' সময়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাজ, শিক্ষা, চিকিৎসা, নিরাপত্তার কোনো নিশ্চয়তা থাকে না সেখানে করোনা যে সবাইকে মহাসমুদ্রে ফেলে দেবে এটা বিস্ময়কর কিছু নয়। করোনা অচলাবস্থা যখন থেকে শুরু হয়েছে তখন থেকেই বহু মানুষের আরও বেশি মাত্রায় কর্মহীনতা, অনাহার, অনিশ্চয়তা শুরু হয়েছে। একইসাথে দেখা দিয়েছে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্রীর অভাব। প্রথমদিকে যখন সরকার অপ্রস্তুত, বিভিন্ন বড় গোষ্ঠীও এগিয়ে আসেনি তখন সমাজের বিভিন্ন সংগঠন ও গোষ্ঠীর উদ্যোগই ভরসা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাংলাদেশে সরকারিভাবে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয় মার্চ মাসের ৮ তারিখ। দিনে দিনে সরকারের প্রস্তুতির দৈন্য ও সমন্বয়ের সমস্যাও প্রকট হতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে নাগরিকদের বিভিন্ন অংশের পক্ষ থেকে ত্রাণ তৎপরতা ছাড়াও জরুরী করণীয় নিয়ে সরকারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সুপারিশমালা হাজির করা হয়।

এর প্রথমটি ছিল প্রধানমন্ত্রীর কাছে খোলা চিঠি (২২ মার্চ, ২০২০), দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি ছিল যুক্ত বিবৃতি, দেয়া হয় যথাক্রমে ৩১ মার্চ ও ২ এপ্রিল। এছাড়া করোনাকালে মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় ১৩ এপ্রিল। ২২ এপ্রিল স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে করণীয় সুপারিশমালা প্রকাশ করা হয়। এছাড়া গার্মেন্ট শ্রমিকদের নিয়ে গার্মেন্টস মালিক, বিজিএমইএ এবং সরকারের নিষ্ঠুর তৎপরতার প্রামাণ্য চিত্র হিসেবে 'মারণখেলার

টাইমলাইন (২১ মার্চ-২৫ এপ্রিল ২০২০)' এবং ত্রাণের দাবিতে ও ত্রাণ নিয়ে দুর্নীতির প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনগণের বিক্ষোভের একটি টাইমলাইন প্রকাশ করা হয়। এছাড়া ত্রাণ তৎপরতা মনিটরিং-এর উদ্যোগও নেয়া হয় এপ্রিল মাস থেকে। (এগুলো পাওয়া যাবে এই লিংকে: http://sarbojonkotha.info/sarbojonkotha-6-3/)

২২ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে লেখা খোলা চিঠিতে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের সাথে সাথে মূল দাবিগুলো ছিল: (১) শ্বেতপত্রের মাধ্যমে করোনা মহামারি রোধের পরিকল্পনা ও তা কার্যকর প্রণালী জনসমক্ষে প্রকাশ করা। (২) দেশের সর্বত্র বিনামূল্যে টেস্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় কিটসহ বিভিন্ন সামগ্রী সরবরাহ এবং তার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। মাস্ক, সাবান, স্যানিটাইজার যোগান নিশ্চিত রাখা। কিট তৈরির কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে দ্রুত খালাস ও ট্যাক্স-মওকুফের ব্যবস্থা গ্রহণ। (৩) দেশের সকল প্রবেশপথ-- বিমান, নৌ, স্থলবন্দর, রেলস্টেশন, নৌ ঘাট সতর্ক নজরদারির আওতায় আনা। (৪) কোয়ারেন্টিনের জন্যে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা থেকে দূরে বড় হোটেল-মোটেল-রিসোর্টসহ উপযোগী ভবনগুলো অস্থায়ীভাবে ব্যবহারের জন্যে নির্দিষ্ট করা। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্টেডিয়াম, জিমনেশিয়াম, খালি ভবনে অস্থায়ী হাসপাতাল নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনায় সেনাবাহিনীকে যুক্ত করা। সিএমএইচ, বেসরকারি হাসপাতালগুলোকে সমন্বিত পরিকল্পনায় যুক্ত করা। (৫) ডাক্তার-নার্স-চিকিৎসাকর্মীসহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীর নিরাপদ পোশাক ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা। স্বাস্থ্যকর্মীদের দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার জন্যে দ্রুত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। দেশের গার্মেন্টস কারখানা ব্যবহার করে স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তার জন্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে পিপিই সরবরাহ। (৬) গণপরিবহন ও গণপরিসরগুলো নিয়মিত জীবাণুমুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ। জেলখানার ঝুঁকিপূর্ণ জনচাপ দূর করে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা, জনচাপ কমাতে বিনা বিচারে আটক, মেয়াদ-উত্তীর্ণদের মুক্তি দান। ছিন্নমূল ভাসমান মানুষদের জন্যে নিরাপদ স্থানে আশ্রয়শিবির খুলে তাদেরকে সরিয়ে নেওয়া। গাদাগাদি বাস করা বস্তিবাসীদের নিরাপত্তায় প্রতিটি বস্তিতে পরিচ্ছন্নতার উপকরণ সরবরাহ এবং করোনা মনিটর সেল/ক্যাম্প স্থাপন করা। রোহিঙ্গা আশ্রয়কেন্দ্রেও অনুরূপ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ। রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ। (৭) করোনা সংক্রান্ত জরুরি কাজ ছাড়া পোশাক কারখানাসহ বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকদের আপদকালীন সময়ে সবেতন ছুটি প্রদান। ছুটিকালীন শ্রমিকদের মজুরি যাতে ঠিকমতো পরিশোধ হয়, সরকারের পক্ষ থেকে তা নিশ্চিত করা। (৮) নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মজুতদারি বন্ধ করে ন্যায্যমূল্যে বিক্রয়, নিম্ন আয়ের এবং রোজগার হারানো মানুষদের জন্যে রেশনিং-এর ব্যবস্থা গ্রহণ। উদ্বাস্তু, দিনমজুর, রিকশাওয়ালা, বস্তিবাসী, কারখানার শ্রমিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি, ছোট ব্যবসায়ীসহ যাদের জীবিকা হুমকির মুখে তাদের জন্যে বিশেষ ভাবে অর্থনৈতিক সুরক্ষা প্রদান। ঋণখেলাপি, চোরাই টাকার মালিকদের কোনো বাড়তি সুবিধা না দেয়া। (৯) বিশেষজ্ঞ, স্বাস্থ্যকর্মী, ধর্মীয় নেতাদের সাহায্যে পাড়ায় পাড়ায় স্থানীয় ক্লাব, সংগঠন ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ ও পর্যাপ্ত সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রদান করে তাদের প্রচার ও রোগ-প্রতিরোধে কাজের সুযোগ প্রদান। (১০) এর পাশাপাশি ডেঙ্গু এবং চিকনগুনিয়া মোকাবেলায় সরকারের পরিকল্পনা প্রকাশ।

৩১ মার্চ যুক্ত বিবৃতিতে করোনা বিষয়ে সঠিক তথ্য প্রকাশ এবং মতপ্রকাশের অধিকারের দাবি জানানো হয়। ২ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, গবেষক, সংগঠকদের পক্ষ থেকে দেয়া আরেক যুক্ত বিবৃতিতে করোনা ভাইরাসে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে জরুরি ভিত্তিতে সরকারের করণীয় বলে ছয়টি কাজ নির্দেশ করা হয়। এগুলো হল: (১) অন্তত তিনমাসের জন্য এক কোটি পরিবারকে বিনামূল্যে খাদ্যসহ অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির যোগান। (২) বিনামূল্যে সকলের চিকিৎসা নিশ্চিত করা। (৩) কৃষকের ফসল, সব্জি, ফলের সঠিক দাম নিশ্চিত করার জন্য সরকারের কৃষিপণ্য ক্রয়ব্যবস্থা সম্প্রসারণ। (৪) সকল প্রতিষ্ঠানে বেতন-মজুরি নিশ্চিত করা। (৫) ক্ষুদে উদ্যোক্তা ও

কৃষকদের জন্য সহজশর্তে ঋণ সহজলভ্য করা। এবং (৬) পাহাড় ও সমতলে আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং উদ্বাস্তু রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সহায়তা প্রদান করা, চিকিৎসা নিশ্চিত করা।

এই যুক্ত বিবৃতিতে আরও বলা হয় যে, এসব সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে ৭০ থেকে ৯০ হাজার কোটি টাকার একটি প্যাকেজ বরাদ্দ প্রয়োজন। আর এই বরাদ্দের জন্য জনগণের ওপর নতুন বোঝা চাপানোর দরকার হবে না। কয়েকটি গোষ্ঠীর কাছ থেকে জনগণের লুণ্ঠিত সম্পদের কিয়দংশ উদ্ধার করলেই এই বিপদ থেকে জনগণকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে। কারণ গত দশ বছরে দেশ থেকে বাইরে পাচার হয়েছে কমপক্ষে ৭ লক্ষ কোটি টাকা। দেশের বিভিন্ন ব্যাংকে খেলাপি ঋণ প্রায় দেড় থেকে ২ লক্ষ কোটি টাকা, এর মধ্যে দশটি গ্রুপের হাতেই আছে ৩০ হাজার কোটি টাকার বেশি। সরকারের পক্ষে এদের চিহ্নিত করা খুবই সহজ, এদের অর্থ বিদেশ থেকে ফেরত আনা সময়সাপেক্ষ হলে দেশে তাদের সম্পদ বাজেয়াফত করে সরকার এই বিপদকালীন তহবিল গঠন করতে পারে।

এরপর ২২ এপ্রিল অনলাইন সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে লেখক শিক্ষক সংস্কৃতিকর্মীদের পক্ষ থেকে সরকারের করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়। এর উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নিম্নরূপ: (১) কর্মহীন, স্বল্প আয়ের মানুষদের (মজুর, বেকার, ক্ষুদে ব্যবসায়ী) ঘরে ঘরে খাদ্যসামগ্রী, নগদ অর্থ ও ত্রাণ পৌঁছানো। (২) সকল শিল্প ও প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারী, পেশাজীবীদের বকেয়া পরিশোধ, ছাঁটাই বন্ধ, এবং ছুটিকালীন পূর্ণ মজুরি নিশ্চিত করা। (৩) কোভিড-১৯ সহ সকল রোগের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা। কোভিড-১৯ চিকিৎসায় জেলা-উপজেলা পর্যায়ে স্বতন্ত্র বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন, প্রতি জেলায় ল্যাব স্থাপন করে টেস্টের সংখ্যা বাড়ানো। সকল ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা, পর্যাপ্ত ও মানসম্মত পিপিই প্রদান করা, আবাসিক হোটেল, গেস্ট হাউজগুলোতে তাদের থাকার ব্যবস্থা। যে ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা চিকিৎসা দিতে গিয়ে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের পরিবারকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান। স্বাস্থ্যখাতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ। (৪) সকল কৃষক ও খামারির পণ্য বাজারজাতকরণ এবং যুক্তিসঙ্গত দামে বিক্রয় নিশ্চিত করা। সরাসরি কৃষক ও খামারি থেকে সরকারের খাদ্যপণ্য ক্রয়ের পরিধি বাড়ানো। কৃষককে স্বল্পসুদে দেয় ঋণের পরিধি ও পরিমাণ বাড়ানো। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না-হওয়া পর্যন্ত সরকার, ব্যাংক ও এনজিও প্রদত্ত ঋণের সকল কিস্তি স্থগিত করা। (৫) মহাদুর্যোগ মোকাবিলায় অবাধ তথ্যপ্রবাহ এবং নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা। (৬) দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা, বাজারে খাদ্যদ্রব্য সহ প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ অব্যাহত রাখা। মজুতদার, চোরাকারবারিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ। সারাদেশের ত্রাণচোরদের কঠোর হস্তে দমন। (৭) জাতীয় সক্ষমতা বিকাশে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ ও গবেষণা বাড়ানো। এবং (৮) দীর্ঘমেয়াদে উন্নয়ন দর্শনে মৌলিক পরিবর্তন আনা।

উপরের বর্ণনা দেখে যে কেউ উপলব্ধি করবেন যে, নাগরিকদের বিভিন্ন উদ্যোগ ও সুপারিশে সরকার সাড়া দিলে বাংলাদেশ এখন অনেক নিরাপদ থাকত। বিশ্বব্যাপী করোনা সংকট পরিবর্তনের অনেক বার্তা দিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে এখনও সর্বজনের সম্পদ কিছুজনের হাতে স্থানান্তর, নাগরিকদের জীবন ও দেশ বিপন্ন করে নানা প্রকল্প গ্রহণ, নাগরিকদের কোনো মতামত গ্রহণ না-করার রাষ্ট্রনৈতিক চর্চা অব্যাহতই থাকছে। তাই বিভিন্ন দিক থেকে আমাদের বিপদ আর বিপন্নতাও বাড়ছে।

করোনার বার্তা

বিশ্বকে থামিয়ে দিল যে করোনা সেই থামাটা যেন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। কিছু লোকের অতিভোগে, লোভে আর হিংস্রতায় বিশ্ব কাতর, বিশ্বের সাগর মহাসাগর বায়ুম-ল নদী-পাহাড় সব মুনাফার তা-বে ক্ষতবিক্ষত।

সামরিকীকরণ আর প্লাস্টিকের জৌলুস মানুষসহ সকল প্রাণকে জীবনের কিনারে এনে ফেলেছে। শ্বাস নেবার বাতাস আর পানের পানিও ঢেকে যাচ্ছে মারণাস্ত্র আর বিষে। মুনাফার পেছনে উন্মাদ হয়ে দুনিয়া যেভাবে ছুটছিল তাকে কেউ থামাতে পারেনি, এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাইরাস থামিয়েছে। তাই এই থামায় মানুষ ছাড়া দুনিয়ার আর সবাই যেন এখন স্বস্তিতে। কারণ কঠিন নির্মম থামা। বিশ্ব যে অখ- সেটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে এই বিপদ ভাইরাস। কিন্তু এই উন্মাদ ছোটাতে যে মানুষেরা বিপদে থাকে, থামাতেও তারা বিপদে, কাজ এবং খাদ্য সংকটে। এই থামা যদি দুনিয়ার গতিমুখ পরিবর্তন করতে না পারে এরপর আরও বড় বিপদ থেকে মানুষের উদ্ধার নেই।

করোনা ভাইরাসের বৈশ্বিক সংকট আরও স্পষ্টভাবে আমাদের জানাল যে, স্বাস্থ্যসেবা কোনোভাবে বেচাকেনার বিষয় হতে পারে না, ব্যক্তিগত মুনাফার ক্ষেত্র হতে পারে না, স্বাস্থ্যসেবা প্রতিটি নাগরিকের অধিকার। রাষ্ট্রের দায়িত্ব সর্বজনের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। বাংলাদেশে চিকিৎসা খাতে জিডিপি অনেক বেড়েছে, কারণ বাণিজ্যিক হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অনেক বিনিয়োগ হয়েছে। সেগুলোর জৌলুস অনেক বেশি, খুবই ব্যয়বহুল, পাঁচতারা হোটেলের মতো থাকার ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু যখন আমরা করোনায় বিপর্যস্ত তখন এই বাণিজ্যিক হাসপাতালগুলোর অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে কারণ এই ব্যাপক স্বাস্থ্য বিপর্যয়ে যথাযথ ভূমিকা পালনে লাভের বিষয়টি নিশ্চিত নয়।

যদি দেশে এরকম পরিস্থিতি থাকত যে, ঢাকা থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত সর্বজন স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা কাজ করছে, গ্রাম পর্যায়েও পর্যাপ্ত সংখ্যক ডাক্তার-নার্স, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, চিকিৎসা সরঞ্জাম আছে, যদি চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণায় বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো যৌথভাবে এগিয়ে থাকত তাহলে বাংলাদেশের মানুষ আজ অনেক নিরাপদ থাকতেন। একদিকে অনাহারে অন্যদিকে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর হুমকির মুখে বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষকে থাকতে হত না।

বস্তুত করোনাকালে বাংলাদেশের মানুষের নিরাপত্তাহীনতার উৎস বর্তমান উন্নয়ন ধরনের মধ্যেই পাওয়া যাবে। খেয়াল করতে হবে যে, যে উন্নয়নের ধারায় আমাদের বন শেষ হয়ে যায়, নদী দূষিত হয়, প্রাণ-প্রকৃতির বিনাশ হয়; যে উন্নয়ন ধারায় ব্যাংক, প্রবাসী আয়, সর্বজনের সম্পদের উপরে কতিপয় গোষ্ঠী আধিপত্য বিস্তার করে, সম্পদ পাচার করে, লুণ্ঠন করে; যে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সম্পদের কেন্দ্রীভবন ঘটে এবং গণতন্ত্র বিপন্ন হয় তা কখনোই মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে না। যে উন্নয়নে মানুষের খাদ্য-পুষ্টি-চিকিৎসার গুরুত্ব নেই, মতপ্রকাশ ও নিরাপত্তার গুরুত্ব নেই, ন্যূনতম আয়ের নিশ্চয়তা নেই, প্রাণ-প্রকৃতি নদীনালা খালবিলের গুরুত্ব নেই তা যে কোনো উন্নয়ন নয় তা সামাজিক উপলব্ধির মধ্যে আনা দরকার।

তাই বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে প্রকৃত উন্নয়নের পথে হাঁটতে গেলে জরুরিভিত্তিতে যেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সেগুলো হল:

- সুন্দরবনসহ প্রাণ-প্রকৃতি-বিনাশী সকল কয়লা এবং পারমাণবিক প্রকল্প অবিলম্বে বন্ধ করে পরিবেশবান্ধব, সুলভ, স্বনির্ভর মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা। অপ্রয়োজনীয় ক্ষতিকর প্রকল্প বাতিল করে তার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ জরুরি ত্রাণ, চিকিৎসা ও জাতীয় সক্ষমতা বিকাশে ব্যয় করা।
- দেশের সমগ্র স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে ব্যক্তি ব্যবসা মুনাফামুখী অন্ধত্ব থেকে মুক্ত করে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত অভিন্ন রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণ করা। এই খাতে জিডিপি-র কমপক্ষে ৬ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ করা এবং স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণাকে গুরুত্ব প্রদান। চিকিৎসক, নার্স,

স্বাস্থ্যকর্মী, চিকিৎসা গবেষকদের জন্য বিশেষ বেতন স্কেল তৈরি করা যাতে তাদের আয়ের অন্য উৎস খুঁজতে না হয়।

- পরিবেশ দূষণের সকল তৎপরতা বন্ধ করা। পরিবেশ রক্ষায় নদী দূষণ-দখল বন্ধ, দূষণকারী ইটভাটা বন্ধ করা। যেসব কারখানা ইটিপি ব্যবহারে শৈথিল্য বা প্রতারণা করে তাদের লাইসেন্স বাতিল। পরিবেশ মন্ত্রণালয় ও অদিধপ্তরে জনবল বাড়িয়ে স্বাধীন ও ক্ষমতাসম্পন্ন করা।
- পাটসহ পরিবেশবান্ধব শিল্প ও জৈব কৃষিতে অগ্রাধিকার প্রদান। এবং
- সকল নাগরিকের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বলয় নিশ্চিত করা; সকল নাগরিকের বেঁচে থাকার ন্যূনতম সামগ্রী যোগান রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ। এর আশু ব্যবস্থা হিসেবে পূর্ণ রেশনিং চালু করা।

করোনাকালে উন্নয়ন-দর্শনে মৌলিক পরিবর্তন আনার সামাজিক চৈতন্য জোরদার করতে হবে। নিছক জিডিপি প্রবৃদ্ধি এবং অন্ধ মুনাফামুখী তৎপরতা নয়; সর্বজনের জীবন-জীবিকা, প্রাণ প্রকৃতি পরিবেশ, শিক্ষা-চিকিৎসা, গণতান্ত্রিক অধিকার ও নিরাপত্তাকেই উন্নয়নের প্রধান শর্ত হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। করোনা সংকট আমাদের সেই তাগিদই দেয়।

[লেখক পরিচিতি: গণমুখী চিন্তক, প্রাবন্ধিক, সম্পাদক, সংগঠক। অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগরবিশ্ববিদ্যালয়।]